রক্তকরবী : শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিসমন্বয়

ড . ফটিক চাঁদ ঘোষ

সারসংক্ষেপ

শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিসমন্বয় দুটোই বিশ্বজুড়ে চলছে। 'রক্ত করবী'তে রবীন্দ্রনাথ উৎপাদানের মালিক, শ্রমিক, পুরোহিত, সর্দার প্রভৃতি পেটিবুর্জোয়া শ্রেণি সকলকে দেখিয়েছেন। কিন্তু পরিণতিতে যা হয়েছে সেটা কি ইতিহাসানুগ। রাজা নিজেই নিজের সাম্রাজ্য ভেঙেছেন। নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে গেছেন। এটা কতটা বাস্তব নাকি কেবলই মনোভাবনা ? অন্য একটি ব্যাখ্যাও আছে। একটি ব্যবস্থা পূর্ণ হয়ে গেলে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। তারই আলোচনা এটি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্র সৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া সভ্যতার নগ্নরূপ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যন্ত্রের অহংকার, যান্ত্রিকতা, অমানবিকতা, মানুষকে পশুত্বে— পণ্যে পরিণত করা, সর্বব্যাপী মনুষ্যত্বের অবমাননা-র ছবি এবং বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কোনো রাজনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নয় মানবতার জায়গা থেকে। মানুষের অপমান, পীড়ন ও লাঞ্ছনা, মানবাত্মার অপমান রবীন্দ্রনাথকে শুধু ব্যথিতই করেনি— তিনি কখনই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ভোলেন নি। অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট মতবাদের পক্ষ নিয়ে নয়—তাঁর মানবপ্রীতির জায়গা থেকে। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যকে নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে বিতর্ক বড় কম হয়নি। কিন্তু তার সবগুলি ছিল একপেশে। এক বিশেষ সীমাবদ্ধ দৃষ্টির মাপকাঠিতে। ফলে সামগ্রিক মূল্যায়নে কোথাও বড় রকমের ঘাটতি থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী, কংগ্রেসী কোনো কিছুই ছিলেন না এমন সংকীর্ণ কোনো পরিচয়ে এই মহামানবকে তাঁর অমূল্য সৃষ্টিকে বাঁধা যায় না। আবার বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, শ্রেণি সংঘাত, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব বাদ দিয়ে কোনো সাহিত্য বিচারই সম্ভব নয়— সেদিনও ছিল না। আজও অসম্ভব। ফলে স্বভাবতই এই বিতর্ক ছিল

স্বাভাবিক। এ নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতবাদ—বিশেষত মার্কসবাদীদের মধ্যে চলমান ছিল।[১] কেননা একথা সত্য সাহিত্য সংস্কৃতি শ্রেণিসংগ্রাম চালনার অস্ত্র।

আর একটি বিষয় আমাদের সকলেরই জানা। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতন হবার পরেও এবং ধনতন্ত্রের উন্মুক্ত বিকাশের পরও একথা সমান পরিমাণে সত্য যে, "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস"।[২] আর চল্লিশের একজন সমালোচকের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে— "এদেশে বাংলা সং স্কৃতিতে রবীন্দ্রযুগ হল উদীয়মান ধনিক সভ্যতার যুগ থেকে আরম্ভ করে ধনিক সভ্যতার অন্তিম যুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভিতর তাই আছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দৈন্যের আত্মসমালোচনা। এই বিদ্রোহ এবং আত্মসমালোচনা তাঁকে অনেক সময় শ্রমিক স্বার্থের কাছাকাছি এনে ফেলেছে কিন্তু ধনতন্ত্রের ভিতরই তিনি সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন।"[৩] উপনিষদ, অধ্যাত্মভাবনা, রায়তদের জমিদানে ক্ষতি এসব ভাবনা রবীন্দ্রনাথের নঞর্থক দিককেই নির্দিষ্ট করে। তা হলেও শেষ জীবনের দিকে মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা প্রভৃতি নাটকে তিনি বাস্তব সমস্যাকে ছুঁয়েছেন। দুই ক্ষীয়মান ও উদীয়মান শ্রেণির সংঘর্ষকে দেখিয়েছেন। 'মুক্তধারা' (১৯২২)য় সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ স্পষ্ট। সেখানেও গণবিদ্রোহ নেই, রাজকুমার অভিজিৎ (যদিও তাকে ঝর্ণাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল) যন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করে মারখানে-ওয়ালার ভিতরের মানুষ ধনঞ্জয়ের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহ, জনগণ নিস্ক্রিয়। তুলনায় 'রক্তকরবী'তে শ্রমিকদের বিদ্রোহ সক্রিয়। কিন্তু এখানেও অনুপ্রেরণা যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণ ও মুক্তি আনন্দ ও জীবনের প্রতীক নন্দিনী। সে অর্থে প্রত্যক্ষ শ্রেণিসংগ্রাম কোথাও নেই।

কিন্তু সাহিত্যকে এভাবে বিচার করা যাবে না। সমগ্র নাটকটি নন্দিনী বলে এক মানবীর ছবি এমন কথা বলতে হয় যাঁকে— অথবা এমনই বলা ও লেখা যাঁর স্বভাবধর্ম তাঁর কাছে আমাদের চাওয়া পাওয়া প্রকৃতি এবং মূল্যায়ন বিচার বদলাতে হবে। আমাদের দেখতে হবে 'শ্রেণি'র পরিচয় সেখানে কতটা আছে। শোষণের প্রক্রিয়া, বুর্জোয়ার চরিত্র মূল্যবোধ কী পরিমানে সেখানে আছে এবং শ্রেণিসংঘর্ষ আছে কিনা— তার চেয়েও বড় বিষয় সেই শোষক শ্রেণির পরাজয় তাঁর নাটকে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে কিনা। একথা সত্য যক্ষপুরীর প্রণহীন যান্ত্রিকতায় নন্দিনী প্রাণ এনেছে। গান এনেছে, বিহঙ্গের মতো মুক্তির স্বাদ এনেছে— সে আনন্দ সে উপনিষদ— তবু তার আরও একটি পরিচয় আছে— সেও গাঁয়ের কৃষকদের মেয়ে এবং তারও এক শক্তি আছে- সে রঞ্জন। সেও শ্রমিকদের মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করে গেছে প্রাণ দিয়ে। আমরা মাত্র দুটি বিচার করবো। প্রথমত, শ্রেণি এবং শ্রেণি শোষণের পরিচয় কীভাবে এসেছে এবং দ্বিতীয়টি সেই শ্রেণি সংঘর্ষে অথবা পতনে লেখক কার পক্ষ নিয়েছেন।

এই বিচার আমার করবো লেলিন, স্ট্যালিন মাওয়ের চিন্তা থেকে নয়। কেবলমাত্র আজও

যা সমান প্রাসঙ্গিক ও পুনঃ পুনঃ পাঠের প্রয়োজনীয়তার দাবি রাখে সেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সূত্র ধরে। সুতরাং এখানে শ্রেণি, শ্রেণিসংগ্রাম ইত্যাদির কী পরিচয় আছে তা আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করে নেবে।

ক) সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণি বিরোধ শেষ হয়ে যায়নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণি, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধারণ।

খ) মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি বিজ্ঞানী সকলকেই তারা পরিণত করেছে তাদের মজুরি-ভোগী শ্রমজীবীরূপে।[৫]

গ) গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণি শহরের পদানত করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর এবং এইভাবে জনগণের এক বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রামজীবনের মূঢ়তা থেকে।[৬]

ঘ) ... আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ— ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই জাদুকরের মতো সে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কের আধুনিক উৎপাদন শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস।[৭]

ঙ) যে পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণি, মেহনতীদের এ শ্রেণিটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর যতক্ষণ জোটে শুধু ততক্ষণ তাদের পুঁজি বাড়তে থাকে। এই মেহনতীদের নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেচতে হয়। বাণিজ্যের অন্য সামগ্রীর মতোই তারা পণ্যদ্রব্যের সামিল। আর সেই হেতু নিয়তই প্রতিযোগিতা আর সবকিছু ঝড় ঝাপটা, বাজারের সবরকম ওঠানামার অধীন তারা।[৮]

চ) ... মজুর হয়েছে যন্ত্রের লেজুড়, তার কাছে চাওয়া হয় অতি সরল, একান্ত একঘেয়ে, অতি সহজে অর্জনীয় যোগত্যটুকু। সুতরাং মজুরের উৎপাদন খরচটাও সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে প্রায় একান্তই তাকে বাঁচিয়ে রাখার ও তার বংশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুর মধ্যে।[৯]

ছ) শিল্পবাহিনীর সাধারণ সৈন্য হিসেবে তারা (শ্রমিক) থাকে অফিসার সার্জেন্টদের এক খাঁটি বহুধাপী ব্যবস্থার অধীনে। মজুরেরা কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণির ও বুর্জোয়া দাস

নয়; দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হচ্ছে যন্ত্রের দাস। পরিদর্শকের দাস, সর্বোপরি খাস বুর্জোয়া মালিকটির দাস।[১০]

জ) শেষ পর্যন্ত শ্রেণিসংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে, তখন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে, বস্তুতপক্ষে পুরানো সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে ভাঙ্গনের যে প্রক্রিয়া চলছে তা এমন একটা প্রখর হিংস্র রূপ নেয় যে শাসক শ্রেণির একটা ছোট অংশ পর্যন্ত ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, হাত মেলায় বিপ্লবী শ্রেণির সঙ্গে। সেই শ্রেণির সঙ্গে যার হাতেই ভবিষ্যৎ। সুতারং আগেকার এক যুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণির দিকে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই এমন বুর্জোয়াদের একটা ভাগ যোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে। বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের কিছু কিছু, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের তুলতে পেরেছে।[১১]

রবীন্দ্রনাথ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' বা 'পুঁজি' কিছুই হয়তো পড়েন নি। রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন এসব নাটক লেখার আগের পরে (রাশিয়ার চিঠি লেখা শুরু ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ (১৩৩৮ এর ২৫ বৈশাখ)। কিন্তু আমরা ভুলবোনা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ। গান্ধি নয়, চিত্তরঞ্জন নয় করো কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে অরাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন। হিজলী বন্দিশালায় গুলিচালানার প্রতিবাদে ১৯৩১ এর ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফ্যাসিবিরোধী সভায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবন— স্রোতের মতো এক ধারাবাহিক বিকাশ ও পরিণাম। চূড়ান্ত বিরোধিতার দিনেও সেদিনের সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যথার্থই বলেন—

> "বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একটি সত্যকে তিনি মর্মে মর্মে গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে ইতিহাসের গতিশীলতা, পুরাতনের গর্ভে নতুনের অভ্যুদয় এবং সমাজ ব্যবস্থার অনিত্যতা। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত। এই দৃষ্টি ছিল বলেই ধনতান্ত্রিক সমাজের আত্মবিরোধ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল।"[১২]

কবি ঋষি। দূরদৃষ্টি থাকা তাঁর স্বাভাবিক। উপরের মূল সূত্রগুলি 'রক্তকরবী'তে কেমন সহজে মেলে। সে কেবল রবীন্দ্রনাথ সৎ ও মহৎ সাহিত্যিক বলেই। পাঠক সহজেই তা মিলিয়ে নিতে পারবেন। তবু একবার আমরা সেই প্রয়াস নিতে পারি— সংক্ষেপে সরলরেখায়। যদিও কবি এবং শ্রেণির কথা ভুলে যেতে বলেছিলেন, শুধু মানবী নন্দিনীকে মনে রাখতে বলেছেন। আরো বলেছেন ধন সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টায় মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু নারীর নিগূঢ় প্রবর্তনায় পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করেছে।[১৩] কিন্তু এ তো নাট্য–সত্য–বস্তুবাদী পাঠক এবং এর থেকে শ্রেণির পরিচয়, ভাঙন এসবই আহরণ করবেন।

রক্তকরবীর রাজা থাকেন জালের আড়ালে। তাঁকে দেখা যায় না। যক্ষপুরীর কাজ

পরিচালনা করে মোড়ল, সর্দার, অধ্যাপক, গোসাঁই প্রমুখ। আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদানের মালিক শিল্পপতিরাও থাকে আড়ালে। আমরা দেখি নেতা, মন্ত্রী, আমলা ও ধর্মধ্বজাধারীদের। অধ্যাপক বলেছেন— "আমরা যে সেই মরা ধনের শব সাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাবো মুঠোর মধ্যে।" বলা বাহুল্য এ উক্তি ও কাজ বুর্জোয়াদের। অধ্যাপক জানিয়েছেন তিনিও এক খণ্ডিত সত্তা। সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি।' বুর্জোয়া শাসনে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট করেছেন।

এদিন নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনের দেখা হবে। সৌন্দর্য ও শক্তিতে মিলে কল্যাণ— রবীন্দ্রনাথ এখানেও বস্তুবাদীর মতো কথা বলেছেন। যক্ষপুরী গ্রহণলাগাপুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। বুর্জোয়াদের এই সম্পদের লালসা প্রতি মুহূর্তে জীবনকে খণ্ডিত করছে। সেকথা রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা জায়গায় বলেছেন। রাশিয়ার সম্পদের গরিমা হীনতাই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। রাজা তাই সব সম্পদের মালিক হয়েও 'আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।' আর বুর্জোয়ারা সম্পদ সংগ্রহ করে কার্যত অভিসম্পাত বয়ে আনে। বলেছে নন্দিনী।

এমন কথা আমরা আরো দেখবো সংলাপে। তার আগে বলে নিই আমাদের প্রাথমিক কথাটুকু। 'রক্তকরবী' শ্রেণিসংগ্রাম বা শ্রেণিসমন্বয়— এমন প্রশ্ন উঠেছে কেন। উঠেছে দুটি কারণে। প্রথমত, রাজাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এমন করে এঁকেছেন যাতে তিনি কোথায় ভয়ংকর হয়েও তার রিক্ততা শূন্যতা ব্যর্থতার হাহাকারকে সহজ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে রাজাকে শোষক শ্রেণির নির্মম ক্রুর বুর্জোয়া শক্তির প্রতিভূ বলে মনে হয়নি। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ। তারাশঙ্কর, বঙ্কিম, সত্যজিৎ কেউই ভারতবর্ষে রাজা জমিদারদের দূরের লোক ছিলেন না। তারা যে শোষণ করে কী নির্মমভাবে তাদের শ্রেণি অবস্থানের জন্য তা স্পষ্ট স্বীকার করেননি। সর্বব্যাপী মানবতাবাদ ও সহানুভূতি তাই রাজা চরিত্রকে এমন কোমল করেছে। তার ক্রূরতাকে ঢেকে দিয়েছে। বুর্জোয়া দানবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের যে ঘৃণা তা মোটেই এই রাজার মধ্যে প্রকাশ পায়নি। এ রাজাকে পড়ে বা দেখে। পঠাক দর্শক মোটেই ভয় বা ঘৃণা করবেন না। বরং করুণায় ও সহমর্মিতায় সমব্যথী হবেন হতে চাইবেন। এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক একটি মায়া মাত্র। এ কথা সত্য রাজা যে মৃত্যু শূন্য জ্ঞানহীন এ নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু নিজেই তিনি বারবার স্বীকার করেছেন। নন্দিনীর ক্ষুদ্র তুচ্ছ সৌন্দর্য আনন্দ ও মুক্তির জন্য তৃষার্ত ও ব্যাকুল হয়েছেন। বাস্তবে স্বীকার করেছেন। তারা রিক্ত ক্লান্ত নিঃস্ব হয়েও সম্পদ ও শোষণ বাড়িয়ে চলে। যুদ্ধ বাধায় উপনিবেশ গড়ে। কখনও বলে না সব কলকারখানা উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে নন্দিনীদের কাছে যাবে। ফলে ই রাজার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া নিষ্ঠুরতা রবীন্দ্রনাথ প্রতীকায়িত করতে পারেননি। অথবা চাননি। এটাকে নাটকের ত্রুটি বলে ধরে নিতে হবে। এখানেও রয়েছে কবির সর্বব্যাপী মানবতা স্ববিরোধও বটে। যে

কবি 'দুই বিঘা জমি' লেখেন তিনিই বলেন 'আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর' (চিত্রা)। যে কবি প্রশ্ন করেন 'যাহারা তোমার বিয়াইছে বায়ু নিবাইয়ে তব আলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো ? (প্রশ্ন),' তিনিই বলেন— বল ক্ষমা করো (আফ্রিকা)। তাছাড়া ১৯২৩ বা ২৬ এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেলেও বুর্জোয়াদের দাঁত নোখ তেমন করে বেরোয়নি যা বেরিয়েছে ১৯৩৬ এর পরে। ফলে রবীন্দ্রনাথ এখানে রাজার শূন্যতাকে যতখানি দেখিয়েছেন বর্বরতাকে তেমন করে দেখাননি। তাই শ্রেণি সমন্বয়ের প্রশ্ন আসে। রাজার কয়েকটি সংলাপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

- পৃথিবীর নীচের তলায় পিন্ড পিন্ড লোহা সোনা— সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে— সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি, সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারিনে।
- আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না—
- বুঝতে পারবে না আমি প্রকান্ড মরুভূমি। তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি— আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত, তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কতটা উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছেনা।
- যে পাহাড়ের ধ্বংসের কথা রাজা জানাচ্ছেন তাও তাঁকে জ্ঞানপাপী করে তুলেছে।
- সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারি নট বালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সমগ্র নাটক জুড়ে রাজার যে হুঙ্কার শোনা গেছে তা অল্পমাত্র। তাকে ছাড়িয়ে গেছে তার বেদনা, জ্ঞান, রিক্ততা, সৌন্দর্য ও মুক্তি-পিপাসা, কবিত্ব। এ বাস্তবের রাজা নয় কবির কল্পনার রাজা। ভাবা যায় আম্বানী, টাটা, বিল গেটস, মনোমোহন বা বারাক ওবামা বা হিন্দুস্থান লিভারের মালিকেরা এমন করে রিক্ততার কথা বলছে। মুক্তির কথা বলছে। এ হাস্যকর সত্য হয়েও সত্য নয়। যদিও একথা স্বীকার করতে হবে রাজা একথা বলেও নিজে ক্ষেত্র ছেড়ে বেরোয়নি। আশ্চর্য সুন্দর জীবন বোধের এক চিত্রকল্প রাজা দিয়েছেন। একটি ব্যঙকে রাজা টিপে মেরে ফেলেছেন কারণ জিজ্ঞাসা করার রাজা যা বলেছেন— 'এই ভাবে কী করে টিকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখেছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগলো না, . . .নিরন্তর বেঁচে থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি।'—একথা রাজাকে মানায়না। বরং নন্দিনী বা বিশুর মুখে রাজাকে হত্যা করে ও সংলাপ দিলে তা ঢের বেশি বাস্তবাসম্মত হত। রাজা নিজেই তো সেই

ব্যাঙ। নাকি এ রাজার শেষের কর্মের পূর্বাভাস দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাও অবাস্তব অসম্ভব। কেমন করে রাজা বলবে— 'মরণের মাধূর্য কখনো এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না আমি কত শ্রান্ত।' শ্রান্ত হলেও রাজারা, কখনো বুর্জোয়া দানবেরা কখনও এমন কথা বলতে পারে না।

অন্যদিকে নন্দিনীই বা কেমন চোখে অনুভবে দেখেছে রাজাকে। সেখানেও কোনো ভীষণতা নেই। বরং নন্দিনী স্পষ্ট বলেছে— 'ভালো লাগল। কি রকম বলব ? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয়ই এর মজার মধ্যে খুশি লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে। তা নন্দিনীরা করতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়ারা এমন সহস্র নন্দিনীকে অর্থ, ক্ষমতা, প্রলোভনে, নৈতিক অধঃপতন ব্যবহার করে ফেলে দেয়।

এতসত্ত্বেও বলা যায় বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবস্থার দুটি শ্রেণির চরিত্র, সংঘাত অনেকখানি স্পষ্ট এই নাটকে। বিশেষ করে শোষণ ও শোষণ পদ্ধতির উল্লেখ, যক্ষপুরীতে মানুষের শরীর ও মনের ধ্বংস রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ভাবে এঁকেছেন। 'লোকহিত'[১৪] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ে যন্ত্র বানাইতেছে।' পীড়নে শরীর ও মনের তিল তিল মৃত্যু রবীন্দ্রনাথ নগ্ন করে দেখিয়েছেন।

ফাগুলাল মদ খায়। শ্রমিকরা এইভাবে কাজের নিরানন্দের, যান্ত্রিকতার, নিঃশোষিত হবার পীড়া ভোলে। তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিশ্রাম বালাই।' আরো একটি উক্তিতে এই সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচিত– 'ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।' এই তিন আস্ত্রেই বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের জব্দ করে রাখে। বিশুর সংলাপে এই পরাধীনতা ও দাসত্বের বেদনা আরো স্পষ্ট হয়— 'আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ— তাই বারো ঘন্টার সমস্ত হাসি, গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন দাস দাসত্বতেমনি নিবিড় ছুটি।' যক্ষপুরী থেকে পালানোর পথ নেই। বিশু রক্তকরবীর অনবদ্য সৃষ্টি। শ্রমিকের এক পূর্ণ সত্তা তার মধ্যে বিকশিত। শ্রমিক মানেই যে সে নির্বোধ নীরস নয় বরং এক শিল্পী, কবি তা যেন আপন মনের মাধুরী দিয়ে সৃষ্টি করলেও মহৎ সত্যকে ছুঁয়ে গেছেন। বিশুর সংলাপ তীব্র মর্মভেদী।

> "একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে— বলছে 'কাজ করো'। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে— বলছে 'ছুটি! ছুটি!''

কিন্তু মুক্তি কোথায় শ্রমিক শ্রেণির। বিশু বলছে– "সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদিবা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার

নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিম খোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।"

শ্রমিকরা যে মালিকের কাছে মানুষ নয় সংখ্যা— রবীন্দ্রনাথ এর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শাসনে মানুষের যন্ত্রে এবং মূল্যহীনতায় কেবল উৎপাদনের উপায় হিসাবে ব্যবহারের চমৎকার ছবি এঁকেছেন। ৪৭ ফ বা ৬৯৬ শুধু নয় পাড়ার নামও বর্ণ বা সংখ্যায়।

ধর্ম আফিসের মতো। গীতাঞ্জলি-র কবি এখানে তা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। সর্দার তাই 'ভালো কথা' শোনাবার জন্য গোঁসাইকে আনে। কারখানার পাশে মন্দির, খুব চেনা ছবি। গোঁসাইও বলেছেন, 'সর্বদাই অবিচলিত থাকো; তাহলেই ঠাকুরের দয়াও 'তোমাদের' পরে অবিচলিত থাকবে।' তাই সর্দার নির্দেশ দেন করাতিদের পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসতে কারণ তারা খিট্ খিট্ শুরু করেছে। কিন্তু শুধু ধর্ম দিয়ে শ্রমিকদের ভুলিয়ে রাখা যায় না— একথা ধর্মের ব্যবসায়ীরাও জানে। তাই—'তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেন না, নাহংকারাৎ নরো রিপুঃ! ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পাশা।' বারোজন গোঁসাই।

বুর্জোয়া শাসন তবু শ্রমিককে তার অন্তর্নিহিত মানব সত্তা ও শিল্পসত্তাকে শেষ করতে পারে না। নন্দিনীর স্পর্শে বিশুর জেগে ওঠা। কিশোরের প্রাণ তাই প্রমাণ করে। নন্দিনীও রাজাকে জানিয়েছে— 'এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে।' এর উত্তরে অবশ্য রাজার স্বরূপ যেন অনেকটা স্পষ্ট হয় 'আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে পারিনে। তাকে ভেঙে ফেলাও একরকম করে পাওয়া।'

বুর্জোয়ারা গ্রামের কৃষককে শহরের শ্রমিকে রূপান্তরিত করে। শোষণে তাকে ছিবড়ে করে ফেলে। তাদের শোষণ করেই রাজার ভান্ডার উপচে পড়ে। সর্দার তাদের বলেছে— 'রাজার এঁটো'। নন্দিনী দেখেছে তাদের পাশের গাঁয়ের চেনা লোককে। তাদের প্রেতের মতো চেহারা দেখে চমকে উঠেছে। তার আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে 'গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিভে গেল।' অধ্যাপক বুঝিয়েছে— 'ঐ ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই আর ঐ বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।' 'বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষ মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।' বিশুকে পশুর মতো বেঁধে নিয়ে চলেছে যারা তাদের স্বরূপ উন্মোচিত করে বিশু বলে— 'মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না। ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।' 'চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে ! যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি।'

রাজা রঞ্জনকে মারতে চাননি। নাটকে মূল ত্রুটিটার দায় রাজার ওপর না চাপিয়ে সর্দারদের ওপর চাপানো হয়েছে। এও এক আপসপন্থা। যেন রাজা বা মূল ব্যবস্থাটি ভালো। কেবল, আমলা, সর্দার, কর্মচারী এরাই নষ্টের গোড়া। সর্দাররাই তাই রঞ্জনকে মারে। যদিও

তার মধ্যে মেজো সর্দার লোক ভালো। সে রাজাকে ঠকাতে চায়নি। এমনকী মেজো সর্দার 'মেয়েটিকে' জব্দ করতেও রাজি হয়নি। সে দায়িত্ব মোড়লকে দিতে চেয়েছে। 'যে মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনো রকম নোংরামিকেই ভয় করে না।' দেখা যাচ্ছে মেজো সর্দার ও কেনারাম গোঁসাইকে রবীন্দ্রনাথ সৎ, বিবেকবান, মানুষ্যত্ব বোধ সম্পন্ন বলতে চেয়েছেন।

নন্দিনী জেনেছে রাজাকে— 'যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে।' কিন্তু নন্দিনী যক্ষপুরীর ধ্বজদন্ডের দেবতার নাম শুনতে চায়নি গোঁসাইয়ের কাছে। বরং সে বিশ্বাস করেছে– 'তোমাদের ঐ ধ্বজদন্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালে মানুষ চিরদিনই জালে বাঁধা থাকবে না।' অর্থাৎ রাজা বা শোষক শুধরাবে। তার চরিত্র বদল হবে। রবীন্দ্রনাথ শেষে করেওছেন তাই। রঞ্জনের মৃত্যুর কথা জেনে রাজা বদলেছেন। তাঁর রাগ গিয়ে পড়েছে তাঁর কর্মচারীদের ওপর। 'ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।—' তিনি সর্দারকে বেঁধে আনার হুকুম দিয়েছেন। রাজা অনুতপ্ত হয়েছেন— 'আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি! মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।' তাই রাজা নিজেই নিজের সাম্রাজ্য ভাঙতে চলেছেন। নন্দিনীকে ডেকে বলেছেন— তিনি যাচ্ছে না— 'আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না। সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দন্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক– তাতেই আমার মুক্তি।' অধ্যাপক এসে রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। অবশ্য তার আগে বিশু ফাগুলালরা বন্দী শালার শেকল ভাঙতে তৈরি। শুরু হয়ে গেছে শ্রমিক বিদ্রোহ।

রাজা নিজেই নিজের শোষণের কারাগার ভাঙছেন– এইখানেই যত বিতর্ক। রাজা বলেছেন— 'ফিরবে কেন ? ভাঙার পথে আমি চলেছি। ঐ তার প্রথম চিহ্ন— আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।' 'মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি— বেঁচেছি।' একদল বলেন রাজার এই রূপান্তর অসম্ভব। বাস্তবে এমন কখনও হয় না। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি মানুষের চেতনার বিশুদ্ধি ও জাগরণ ঘটিয়েছেন। সে নিজেই শ্রেণিসমন্বয়। এ কখনো সম্ভব নয়। জমিদার কৃষকের হাতে জমি তুলে দিচ্ছে, কারখানার মালিক শ্রমিককে কারাখানা ছেড়ে দিচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্র পীড়িত মানুষ দুঃখে কাতর হয়ে রাষ্ট্রের মালিকানা ছেড়ে দিচ্ছে— এ ঘটনা অবাস্তবোচিত, অনৈতিহাসিক। অবৈজ্ঞানিক।

অন্যদল যুক্তি দিয়ে বলেন যেকোনো রাষ্ট্রের বা ব্যবস্থার পতনের বীজ তার নিজের মধ্যেই থাকে। যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় কোনো ব্যবস্থা, কোনো কিছুই আর সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে না তখন নিজেই তা ভেঙে যায়। রবীন্দ্রনাথ রাজার মধ্য দিয়ে তাই দেখতে চেয়েছেন। কবি নিজেও বলেছেন— 'একই নীড়ে পাপ ও পাপের মৃত্যুবান লালিত হয়েছে।' আমার স্বল্পায়তন

নাটকে রাজনের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকে আপনি পরাস্ত করে।"[১৫] তত্ত্বকথা যাই হোকনা কেন এধরনের পরিণতি পাঠককে বিভ্রান্ত করে। শোষকের প্রকৃত চেহারাকে ঢেকে দেয়। তার অত্যাচার, শোষণ পীড়নকে আড়াল করে দেয়। মানুষকে মায়ার মতো অহেতুক শান্তি এনে দেয়। তাকে ব্যবস্থা ভাঙার সংগ্রাম থেকে বিরত করে। যদিও এদিক থেকে 'মুক্তধারা'র চেয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা এগিয়ে আছেন। 'মুক্তধারা'য় অভিজিৎ একা বাঁধ ভেঙেছে। শিবতরাইয়ের জনতা সেখানে নিস্ক্রিয়। কিন্তু 'রক্তকরবী'তে ফালুলাল, বিশু প্রভৃতি শ্রমিকরা সক্রিয় ও আগুয়ান। রাজা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মাত্র। অধ্যাপকের যোগদান মেনে নেওয়া যায়। আমাদের 'জ' উদ্ধৃতিতে স্বয়ং মার্কস এঙ্গেলস তা বলেছেন। রাজার এই ভূমিকা শ্রেণি চেতনা জাত নয়। একজন পশ্চাৎপদ দেশের (ভারতবর্ষে তখন বুর্জোয়া বিকাশ কিছুই হয়নি, সে একটা উপনিবেশ এবং সামন্ততন্ত্র পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান) মহান মানবতা কবি ও নাট্যকারের নিজের বোধ জাত সিদ্ধান্ত মাত্র। তারাশঙ্করের ক্ষীয়মান সমান্ততন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি একই চেতনা জাত। 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রের শিল্পীরা নিজের মূর্তিভাঙায় যোগদানও একই অনুভূতির ফল। 'জলসাঘর' চলচ্চিত্রের জমিদারের গৌরব এবং তার পতনে চলচ্চিত্রকারের সহানুভূতিও একই চেতনা থেকে উৎসারিত। এ আমাদের দেশের শিল্পীদের সীমাবদ্ধতা।

নাটকটিতে আরো একটি ত্রুটিও রয়েছে। বুর্জোয়া যান্ত্রিকতার বিকল্প রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন গ্রাম্যসভ্যতা কৃষিসভ্যতা তথা সমান্ততন্ত্রের মধ্যে। তাঁর নিজের কথায়—

> "কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে... কৃষি কাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষ হিংসা বিলাস বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসের মতো।... তখনো কি সোনার খনির মালিকেরা নব দূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল ?"
>
> "আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসদের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা চিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন ?"[১৬]

এখানে বুর্জোয়া সভ্যতার চেয়ে সামন্ততন্ত্রের প্রতি টানই শুধু নয় তাকেই বিকল্প হিসেবে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যা অনৈতিহাসিক, অবৈজ্ঞানিক, অসম্ভব। ইতিহাস কখনো পিছনে হাঁটে না। শুধু তাই নয়, নাটকেও সামন্ততন্ত্রের সৌন্দর্য ও শান্তির জয়গানই করা হয়েছে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—' এই 'থিম সং' তারই প্রমাণ। পৌষের পাকা ধান ও মাঠ,

কৃষিকাজ, কৃষিব্যবস্থাই যক্ষপুরীর বিকল্প। নন্দিনী তাই রাজাকে বলেছে— 'তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।' 'মাঠের কাজ যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ' এবং তবু বলি, সোনার পিন্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত।' নন্দিনী এখানে কৃষিকন্যা- মুক্তির দূত যে মুক্তি কৃষিকাজ, তার গ্রাম, অর্থাৎ সমান্ততন্ত্রে আছে। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ অভিজিতের রোম্যান্টিকতা দিয়ে ভাঙিয়ে মুক্তধারার বাঁধকে জমিয়েছিলেন। এখানেও সেই রোমান্স যা নন্দিনীর মধ্যে রূপায়িত।

সুতরাং 'রক্তকরবী' নাটক 'শ্রেণিসংগ্রাম' অথবা 'শ্রেণিসমন্বয়' এমন বিতর্কের অবকাশ নেই। পুঁজিবাদ ভাঙছে, ভেঙেছে, ভেঙে যাবে। এ সত্য নাট্যকার দেখিয়েছেন। বুর্জোয়া শাসনে যখন সঙ্কট পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তার থেকে মুক্তি নেই ব্যবস্থা ভাঙা ছাড়া— তখন চিরকাল বুর্জোয়ারা ঘরে অথবা বাইরে অশান্তি, যুদ্ধ, দাহনে, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি সৃষ্টি করে বাঁচতে চায়, সেই ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করে। এ গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাবে নাটকে বর্ণনা করেছেন—

> 'রাজা বোধ হয় নিজের ওপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরি একটা কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।'
>
> 'আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল। শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের হট্টহাসির মতো খল্ খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।
>
> ''দেখলুম। রাজা নিজের' পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।'
>
> 'বড়ো রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।'

অর্থাৎ 'রক্তকরবী' নাটকে ধনবাদী পুঁজিবাদী সভ্যতার কুৎসিত রূপ, লোভ, হিংসা, শোষণ, ভাঙন সবই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেবল তার ভাঙনের প্রক্রিয়ায় এবং বিকল্প খোঁজায় রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ভাবনার পরিচয় দিতে পারেননি। এ তাঁর দর্শনের সীমাবদ্ধতা যতটুকু ততটুকু দায়ী আমাদের দেশের আর্থসামাজিক পশ্চাৎ পদ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপদার্থতাও সীমাবদ্ধতা। বলশেভিক বিপ্লব এবং লেনিনের উপস্থিতই গোষ্ঠির জন্ম দেয়। রবীন্দ্রনাথের তেমন কোনো আন্দোলন ও আদর্শের পটভূমি ছিল না। তাই তাঁর

সর্ব ব্যাপী সংগ্রামের কথা আছে, শ্রমিকদের সক্রিয়তার কথা আছে। বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভেঙে যাবার অনিবার্যকতার কথা আছে। তাকে শুধুমাত্র 'শ্রেণিসংগ্রাম' অথবা 'শ্রেণি সমন্বয়' এমন মোটা দাগে বিভাজিত বা স্পষ্টীকৃত করা অন্যায়। তার সীমাবদ্ধতাটুকু উল্লেখ করে 'রক্তকরবী'কে পুঁজিবাদী সভ্যতার পরিচায়ক একটি নাটকে বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত।

তথ্য সূত্র

১. বিস্তারিত আলোচনা প্রাপ্তির দ্রষ্টব্য– মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ১, ২, ৩ ধনঞ্জয় দাদা সম্পাদিত, পরিবেশক– প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১ম খন্ড জুন ১৯৭৫, দ্বিতীয় খন্ড মার্চ ১৯৭৬, তৃতীয় খন্ড ১৯৭৮।

২. কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার, কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৬৮ পৃষ্ঠা-৩২

৩. বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা, বীরেন পাল, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক-১, পৃষ্ঠা-২

৪. (২) পৃ- ৩৩

৫. ঐ পৃ-৩৫

৬. ঐ পৃ-৩৭

৭. ঐ পৃ-৩৮

৮. ঐ পৃ-৪০

৯. ঐ পৃ-৪০

১০. ঐ পৃ-৪০

১১. ঐ পৃ-৪৩

১২. এককুা মানবী ও একটি শতাব্দী, ভবানী সেন, (৩) পৃ- ১৬১

১৩. যাত্রী গ্রন্থে আলোচনা কবিকৃত, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ-১১৯

১৪. কালান্তর

১৫. প্রথম সংস্করণ 'রক্তকরবী'র 'প্রস্তাবনা' ১৩৩১ সালে লিখিত কবির 'অভিভাষণ' রক্তকরবী বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৪ পৃ-১৫৫.

১৬. ঐ পৃ- ১১৭